ইউনিট ২

মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাস

পাঠ-১: মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় তুর্কি শাসন বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলায় মুঘল শাসন বর্ণনা করতে পারবেন।

পনের ষোল শতকে ইউরোপে মনীষীরা মধ্যযুগের (Medium aevum) ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন স্বর্ণযুগ (Golden Age) এবং আধুনিক যুগের (Modern Age) মধ্যবর্তী, অন্তর্বর্তী সময়কেই তারা মধ্যযুগ বুঝিয়েছেন। সেই থেকে ইতিহাসে আদি, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ধারণা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মূলত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভবের আগের যুগকেই আমরা মধ্যযুগ বলে থাকি। রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই এ ধারণা প্রযোজ্য।

মধ্যযুগে রাষ্ট্রের চরিত্র থাকে সাধারণত সামন্ত অর্থনীতি নির্ভর রাজতান্ত্রিক শাসনের। তের শতকে থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ড় সময়ে বাংলাদেশ ভূখন্ডে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল তা চরিত্রগতভাবে ছিল রাজতান্ত্রিক। এখানে সুলতান, নবাব, রাজবংশীয় শাসন ইত্যাদি যে নামে বাংলাকে পরিচিত করা হোক না কেন বাংলা শাসিত হতো এক একজন শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মোতাবেক। এখানে সরকার বলতে সুলতান, নবাব, সম্রাট বা রাজাকে বোঝানো হতো। তাদের একক কর্তৃত্ব বিদ্যমান ছিল। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তুলনায় মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক, এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অগণতান্ত্রিকও। রাষ্ট্র শাসনে ধর্মীয় প্রভাব একচ্ছত্র ছিল। তবে পৃথিবীর সব দেশ, সব জাতিকে মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কমবেশি অতিক্রম করেই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটাতে হয়েছে। বাংলাদেশেও আমরা তের শতক থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ-পূর্বকাল পর্যন্ত সামন্ত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে দেখেছি।

বাংলায় তুর্কি শাসন (১২০৪-১৩৬৮)

ভূমিকা :

বাংলা আক্রমণের বহু আগেই আরব, তুর্কি, আফগানসহ অন্যান্য মুসলিম শাসকরা ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্ড়ার শুরু করেন। তাদের রাজ্য জয়ের অংশ হিসেবে ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজি সমগ্র নদীয়া জয় করেন। তিনি তুর্কিদের খলজি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তবে তিনি আফগানিস্তানের গরমিশ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ভারতবর্ষে ভাগ্যের অন্বেষণে এসে শেষ পর্যন্ড় অযোধ্যার শাসক মালিক হুশাম উদ্দিনের রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে সীমান্তরক্ষীর কাজ পান।

ক. নদীয়া অভিযান

শেষ পর্যন্ত তিনিই নদীয়া জয় করে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গৌড় বা লক্ষণাবতী (লখনৌতি) জয় করে সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন।

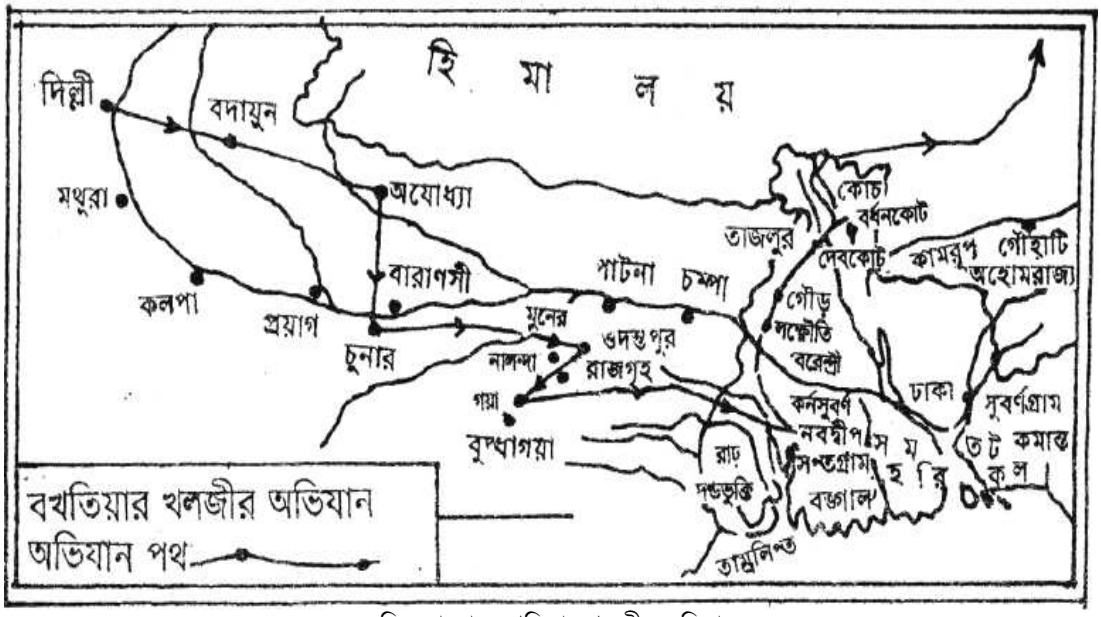

ছবি ঃ বাংলায় বখতিয়ার খলজীর অভিযান

ধীরে ধীরে তিনি উত্তরবঙ্গ দখল করেন। তবে তার শাসন কেন্দ্র ছিল লক্ষণাবতীতে। বখতিয়ার খলজির শাসনামলে বাংলায় যথেষ্ট সংখ্যক মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ (অতিথিশালা) তৈরি করা হয়। তিনি বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নেন। তবে ১২০৬ সালে তিনি তিব্বত অভিযানে বের হয়ে ব্যর্থ হন, দিনাজপুরের দেবকোটে (খলজির প্রতিষ্ঠিত রাজধানী) ফিরে আসার পর এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্বল্পকালীন শাসন ছিল দিলি- র প্রভাবমুক্ত, স্বাধীন।

খ. খলজি পরবর্তী শাসক

খলজির মৃত্যুর পর তিনজন শাসক স্বল্প সময়ের জন্য বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২১২-১২২৭ খ্রি.) বাংলার শাসন, প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি এখানে নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন এবং বাঙালি নাবিকদের সহায়তায় যুদ্ধ জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি দিনাজপুরের দেবকোট থেকে লখনৌতিতে আবার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, একই সঙ্গে একটি দুর্গ স্থাপন করে রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করে সেখানে তার আধিপত্য বিস্তৃত করেন। বলা চলে বাংলায় তিনি দিলি- র সমান্তরাল আর একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন যা দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশের পছন্দ হয়নি। ইলতুতমিশ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদকে খলজির বিরুদ্ধে লখনৌতিতে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে খলজি পরাজিত ও পরে নিহত হন। ইলতুতমিশ নাসির উদ্দিন মাহমুদকে অযোধ্যা এবং লখনৌতি তথা বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এর ফলে ১২২৭ সালে বাংলা দিলি- র একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

গ. দিল্লির করতলে বাংলা

এ সময় থেকে বাংলার শাসনকর্তারা দিল্লির সুলতানদের কাছ থেকে নিয়োগ লাভ করে এখানকার শাসক হতেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই জাতিগত পরিচয়ে তুর্কি ছিলেন। ১২২৭ থেকে ১২৮১ সাল পর্যন্ত তেমন ১৫ জন তুর্কি শাসক বাংলা শাসন করেছিলেন। মজার ব্যাপার হল এসব নিয়োগ প্রাপ্ত শাসকদের মধ্যে ১০ জনই ছিলেন দিল্লির শাসকদের ক্রীতদাস। বাংলার শাসক নিয়োগে দিল্লির শাসকরা ক্রীতদাসদের কেন বাছাই বা পছন্দ করতেন- তা বলা মুশকিল। তবে এ থেকে বাংলাকে দিল্লির শাসকরা কিছুটা হেয় দৃষ্টিতে দেখতেন বললে অত্যুক্তি হবে না। দিল্লির শাসকগণ বাংলাকে যে দৃষ্টিতেই দেখুন না কেন, তাদের মনোনীত বাংলার অধিকাংশ তুর্কি শাসকই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন। ফলে বাংলায় দিল্লির অনুগত কোনো শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং দিল্লির মনোনীত তুর্কি শাসকরাই একের পর এক দিল্লির বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন। দিল্লির শাসকরা (যেমন, ইলতুতমিশ, বলবন, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক) বাংলার শাসকদেরকে প্রতিহত করতে একের এর এক অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন। এর ফলে দিল্লির শাসনকালে বাংলায় বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ লেগেই ছিল।

ঘ. দিলি- ও বাংলার বিরোধ

তবে তুর্কি মামলুক (দাস) শাসকরা কমবেশি সকলেই দিল্লির অধীনতা মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে বাংলার শাসনকার্য পরিচালিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলার শাসকদের বার বার দিল্লির শাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কথা বিবেচনা করে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলার তৎকালীন স্বাধীন শাসক তুর্কির তুঘ্রিল খানকে দমনের জন্য শেষ পর্যন্ত নিজেই লখনৌতি আক্রমণ (১২৮০-৮১ খ্রি.) করেন। যুদ্ধে তুঘ্রিল খান নিহত হন। বলবন তুঘ্রিলের আত্মীয়-স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যা করে লখনৌতিকে মহাশ্মশানে পরিণত করেন। লখনৌতি ত্যাগের প্রাক্কালে তার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা (১২৮১ খ্রি.) নিযুক্ত করে যান, ফলে বাংলা আবার দিল্লির শাসনাধীন হয়। তবে ১২৮৭ সালে দিলিল্লর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মারা গেলে বুঘরা খান নিজেই নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে ১২৯০ সাল পর্যন্তবাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বুঘরা খান তথা নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ দেশে শাসন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বাংলাদশেকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। ১২৯০ সালে দিলি-র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তার ছেলে কায়কোবাদের হত্যার পর তিনি তাঁর ছেলে রুকনউদ্দীন কায়কাউসকে (১২৯০-১৩০১ খ্রি.) বাংলা ও বিহারের ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৩০১ সালে তার মৃত্যুর পর তুঘলক বংশের বাইরে অজ্ঞাত বংশ পরিচয়ের শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৩০১-১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় লখনৌতির ক্ষমতায় ছিলেন।

ফিরোজ শাহের শাসন আমলে রাজ্য হিসেবে বাংলা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তিনি বিহার, উত্তর ও পশ্চিম বাংলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা পর্যন্ত লখনৌতির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অবশ্য সুলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে হুগলি জেলার সাতগাঁও এবং বঙ্গ অঞ্চলে কিছু সাফল্য অর্জন করেছিলেন। শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ সাতগাঁও ও বঙ্গ জয় সমাপ্ত করেন।

এছাড়া সোনারগাঁও, ময়মনসিংহ ও সিলেট (১৩০৩ খ্রি.) তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩০১ সাল হতে সোনারগাঁও টাকশাল থেকে মুদ্রা চালু করা হয়। সুতরাং, সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ বাংলার সীমানা বৃদ্ধি ছাড়াও বাংলায় একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। তাঁর মৃত্যুর পর (১৩২২ খ্রি.) পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মৃত্যুর পূর্বে ফিরোজ শাহ তাঁর পুত্র শিহাবুদ্দিনকে সিংহাসনে বসিয়ে যান। কিন্তু শিহাবের ভাই গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তার অন্যান্য ভাইদেরও বাহাদুর হত্যা করেন। শুধুমাত্র নাসিরুদ্দিন পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যান। নাসিরুদ্দিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দিল্লির সাহায্য কামনা করেন। ফিরোজ শাহ বংশের অভ্যন্ড়রে সৃষ্ট উত্তরাধিকার বিরোধ বাংলায় তুঘলকদের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

দিল্লির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তুঘলক শাসক গিয়াসউদ্দিনও (১০৩২০-'২৫খ্রি.) বাংলার বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালী হওয়াকে সহজভাবে নেননি। তিনি গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহর ভাইদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধকে কাজে লাগিয়ে বাংলার বিরুদ্ধে অভিযান (১৩২৪ খ্রি.) প্রেরণ করেন। দিলি-র সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পালিত পুত্র বহররাম খান এবং সাহায্যপ্রার্থী নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিমকে এ অভিযানে নেতৃত্বে দেন। যুদ্ধে বাহাদুর শাহ পরাজিত এবং ধৃত হন (১৩২৫ খ্রি.)। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বাংলা অধিকার করা নিশ্চিত হয়। বাংলা আবার দিল্লির অধীনে চলে যায়।

বাংলায় তুঘলক বংশের শাসন (১৩২৫-১৩৩৮)

ক. তুঘলক বংশের শাসন

তুঘলক শাসক গিয়াসউদ্দিন লখনৌতি দখলের মাধ্যমে বাংলায় দিল্লির শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দিল্লিতে ফেরৎ যাওয়ার আগে বাংলাকে তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করেন– (১) লখনৌতি-উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র। এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহর ছোট ভাই নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিমকে (তিনি বাংলাকে পদানত করতে আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে তুঘলককে সাহায্য করেছিলেন)। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিমককে যৌথ নামে মুদ্রা প্রবর্তনের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন। (২) সাতগাঁও (হুগলি)- দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রাণকেন্দ্র। (৩) সোনারগাঁও- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র। সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও এর যুক্ত শাসনভার অর্পণ করা হয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পালক পুত্র বাহরাম খানের ওপর। বন্দি গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে লখনৌতি ত্যাগ করে দিল্লি ফেরার পথে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক এক দুর্ঘটনায় নিহত হন (১৩২৫ খ্রি.)।

খ. লখনৌতি-সাতগাঁও সোনারগাঁও-এর উত্থান

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক মারা যাওয়ার (১৩২৫ খ্রি.) পর তার বড় ছেলে মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.) দিল্লির সিংহাসনে আসীন হন। শাসনভার গ্রহণ করার কিছু দিনের মধ্যেই তার পিতার রেখে আসা বাংলার শাসনে তিনি ব্যাপক পরিবর্তন করেন। প্রথমেই তিনি গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহকে মুক্তি দেন এবং তাকে বাহরাম খানের সঙ্গে সোনারগাঁও-এর যুগ্ম শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বাহাদুরের ওপর শর্ত ছিল যে, তার ছেলেকে জিম্মি হিসেবে

দিল্লিতে প্রেরণ, যৌথ নামে মুদ্রা প্রচলন এবং উভয়ের নামে খুতবা পাঠ করতে হবে। কদর খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। সাতগাঁও-কে পৃথক প্রদেশের মর্যাদা দিয়ে ইজ্জতউদ্দিন ইয়াহিয়াকে এর শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিমকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়।

গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর তার ছেলেকে দিল্লিতে ফিরিয়ে নেওয়া ব্যতীত সকল শর্তই পূরণ করেন। তিনি নিজ এবং তুঘলক সুলতানের নামে সোনারগাঁও-এর টাকশাল থেকে মুদ্রা চালু রাখার কাজ ১৩২৮ সাল পর্যন্ড় অব্যাহত রাখেন। ১৩২৮ সালে তুঘলকের আনুগত্য অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। অন্যান্য আমীরদের সহায়তায় বাহরাম খান বাহাদুর শাহকে পরাজিত ও হত্যা করেন। ভবিষ্যতে অন্য কেউ যেন দিল্লির শাসনের বিরোধিতা করার সাহস না পায় সে রকম ভীতি সৃষ্টির লক্ষে বাহাদুর শাহ-এর শরীরের চামড়া ছড়িয়ে বাহরাম খান দিলি- তে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখেন।

গ. লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও শাসন

১৩২৮ থেকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় দশ বছর কদম খান লখনৌতি, ইজ্জতউদ্দিন ইয়াহিয়া সাতগাঁও এবং বাহরাম খান সোনারগাঁও শাসন করেন। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খান মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার বর্মরক্ষক ফখরা নিজেকে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁও-এর স্বাধীনতা ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করেন। এটি অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দেয়। বাংলায় এর পর ইলিয়াসশাহী এবং হুসেনশাহী বংশের দুশ বছরের (১৩৩৮-১৫৩৮) একটি স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করে।

রাজা গণেশের বংশ (১৪১৪-'১৫-১৪৩৬)

ক. রাজা গণেশের পরিচয় ও উত্থান

ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম পর্বের শাসনের পর বাংলার সিংহাসনে রাজা গণেশের উত্থান বেশ আকস্মিক ও বিস্ময়করও। একজন জমিদার হিসেবে বাংলার সুলতানের দরবারে তাঁর প্রভাব ও আসা-যাওয়া ছিল। তিনি সুলতানের একজন ঘনিষ্ঠ অমাত্য ছিলেন। শিহাবুদ্দিন নিহত হলে সৃষ্ট শূন্যতার সুযোগে তিনি বাংলার ক্ষমতায় আকস্মিকভাবেই আরোহণ করতে সক্ষম হন। গণেশের শাসন সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত সবই অনুমাননির্ভর ধারণা বিরাজ করছে।

শাসনের শুরুতেই মুসলিম দরবেশদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। দরবেশদের নেতা নূর কুতুব-উল-আলমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করেন। রাজা গণেশ নতি স্বীকার করেন এবং কুতুব-উল-আলমের সঙ্গে আপস করেন। গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করেন। তার পুত্র জদু বা জিতমল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে বাংলার দরবেশরাও ইব্রাহিম শর্কি জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম গ্রহণকারী জদুকে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। গণেশ মাত্র কয়েক মাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ইব্রাহিম শর্কি জৌনপুরে ফিরে যান। কোনো কোনো সূত্রে গণেশের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার উল্লেখ আছে। কিন্তু এ নিয়ে দ্বিমতও যথেষ্ট রয়েছে। বস্তুত গণেশের ক্ষমতা গ্রহণ, অবস্থান, ত্যাগ করা, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্পর্কে নির্ভর করার মতো তথ্য ও বিবরণ না থাকায় সঠিক ইতিহাস লেখা যাচ্ছে না।

খ. জালালউদ্দীন শাহমুদ শাহ-এর শাসন

গণেশের পুত্র জালালুদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৪১৫-১৪৩১ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করেছিলেন। তিনি পান্ডুয়া থেকে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তর করেন। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের বেশির ভাগ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৪৩১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তার ছেলে শামসুদ্দিন আহমদ শাহ ক্ষমতায় বসেন। তিনি ১৪৩৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। শামসুদ্দিন আহমদ শাহ-এর নির্যাতনমূলক শাসনের ফলে সকলে তার প্রতি হতাশ এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় ১৪৩৬ সালে সাদী খান ও নাসির খান নামক সুলতানের দুজন ক্রীতদাস তাকে হত্যা করেন। তারা ক্ষমতা দখল করলে সম্ভ্রান্ড় ব্যক্তিরা বিদ্রোহ করেন। সাদী খান ও নাসির খানকেও হত্যা করা হয়। এর ফলে গণেশের বংশধরদের শাসনের ইতি ঘটে। রাজা গণেশের শাসনের মাত্র কয়েক মাস ছাড়া তার বংশধরের ধর্মান্তরিত নতুন প্রজন্মই বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। অভিজাতদের গৃহযুদ্ধের এই সংকটকালে তাদেরই কারো কারো সমর্থনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ-এর প্রপৌত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ। শুরু হয় ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্বের শাসন।

ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন (দ্বিতীয় পর্ব ১৪৩৬-১৪৮৭)

ক. পরিচয়

ইলিয়াস শাহ বংশের দ্বিতীয় পর্বের শাসক হিসেবে সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ (১৪৬-১৪৫৯ খ্রি.), তাঁর পুত্র রুকুনুদ্দীন বরবাক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.), তাঁর পুত্র শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) এবং জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.) এর নাম উল্লেখযোগ্য। নাসিরউদ্দিনের রাজত্বকালেই পান্ডুয়া থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত

হয়েছিল। তিনি উদার ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজাগণ শান্তিতে বসবাস করত এবং দেশে শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। নাসিরউদ্দিন দুবার চীনে দূত পাঠান। বরবাক শাহ বাংলার রাজ্য সীমানা উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি আরাকান রাজার নিকট থেকে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এছাড়া সিলেট পুনর্দখল সহ যশোর, খুলনা, বাকেরগঞ্জ তার শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। তিনি নিজে পন্ডিত ছিলেন। তার রাজপ্রাসাদে পন্ডিতদের কদর ছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের লেখক মালাধর বসুকে বরবাক শাহ 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ-এর রাজ্য সিলেট, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও হুগলী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে তিনি গৌড়ে কয়েকটি মসজিদ ও অট্টালিকা স্থাপন করেছেন। তিনি ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে কারো বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। এরপর নাসিরউদ্দিন মাহমুদের পুত্র জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

খ. শাসন ব্যবস্থা

বাংলার ইতিহাসে ইলিয়াসশাহী শাসনব্যবস্থা এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সুলতানগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলার জনগণের সহযোগিতা ব্যতীত এখানে কিছুই করা সম্ভব হবে না। সে কারণে তারা উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুলতানসহ বিভিন্ন ধরনের উপাধি গ্রহণে তারা খলিফার তত্ত্বীয় সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করলেও কার্যত তারা স্বাধীন ছিলেন। সুলতানগণ প্রশাসনের সর্বনিম্ন থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত ক্রমান্বয় পদ্ধতি চালু করেন। সুলতান নিজে শাসন ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি ছিলেন, সব কিছু তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হতো। প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী তিনিই ছিলেন। সমগ্র সালতানাতের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ব তিনিই বহন করতেন। আইন প্রণেতা ও আপীলের সর্বোচ্চ বিচারকও তিনি ছিলেন। এমনকি দেশের সেনাবাহিনী প্রধানও তিনিই ছিলেন। তবে ক্ষমতার প্রয়োগে অধিকাংশ সুলতানই সংযত ছিলেন, শরীয়া আইনের প্রয়োগ, জ্ঞানী-গুণীদের বুদ্ধি পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তবে সালতানাতের প্রকৃত শাসনব্যবস্থা রাজপরিবারের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হতো। দরবারে বেশ সংখ্যক গুণী ও অভিজাত, আমির এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থাকতেন। সুলতান নিজে তাদের উপস্থিতিতে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করতেন। সুলতান কয়েকজন মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ দিতেন, তাদের ওপর বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বও দেওয়া থাকতো। দপ্তরগুলোর মধ্যে অর্থ, বিচার, সামরিক বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য ছিল। সুলতানকে প্রত্যেক বিভাগের মন্ত্রীরা প্রত্যহ দেশের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতেন, সুলতান সেভাবেই সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং নির্দেশ প্রদান করতেন।

গ. শিল্প ও সাহিত্য

ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ শিল্পকলা ও সাহিত্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নতুন সালতানাতের উপযোগী স্থাপত্যরীতির সঙ্গে স্থানীয় স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইমারত নির্মাণ করা হয়। বাংলার কারুশিল্পী ও রাজমিস্ত্রিগণ বাঁকা কার্নিস, নানা ধরনের অলংকার ব্যবহার করেন। এ ছাড়া পোড়ামাটির ফলক ব্যবহারও বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৩৭৪-৭৫ খ্রি. পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ইলিয়াসশাহী যুগের অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন।

এ আমলে হস্তলিপিবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হয়। সুলতানগণ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের স্বীকৃতি প্রদান করেন। তারা বাঙালি কবি ও পন্ডিতদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্য দ্রুত প্রসার লাভ করে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ-এর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহাম্মদ সগীর রচনা করেন ইউসুফ জুলেখা। সুলতানের নির্দেশে বাংলা ভাষায় রামায়ণ লেখা হয়।

ঘ. পতন

ইলিয়াসশাহী বংশের এই পর্বের শাসনের শেষ দিকে ষড়যন্ত্রের ফলেই সুলতান জালালুদ্দিনের মৃত্যু হয়। ফলে উক্ত বংশের শাসনের অবসান ঘটে। স্বল্প সময়ের জন্য বাংলার ক্ষমতায় হাবসিরা অধিষ্ঠিত হয়।

হুসেনশাহী বংশের শাসন (১৪৯৩১৫৩৮ খ্রি.)

ক. ভূমিকা

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে হুসেনশাহীর শাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ আমলকে বাংলার স্বাধীন সালতানাতের খ্যাতির সর্বোচ্চ পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মূলত রাজ্যের বিস্তার, প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, সম্প্রীতি বজায় রাখা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা এবং শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদান রাখার জন্যই এ আমলের শাসনকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়ে থাকে। একই সঙ্গে মর্যাদাও দেয়া হয়ে থাকে। হুসেনশালীর আমলে বাংলা ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে ভারতের অধীনতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এর ফলে বাংলার নিজস্ব সত্তার জাগরণ ঘটার সুযোগ ঘটে। বিশেষত সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলার যে পুনর্জাগরণ হুসেনশাহীর আমলে ঘটে তা উল্লেখ করার মতো ঘটনা। হুসেনশাহীর শাসকরা নিজেদের বহিরাগত পরিচয় বাদ দিয়ে বাংলার সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করার ফলে স্থানীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। তাদের শাসনামলে বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে। তাদের শাসনের

শেষ দিকে মুঘল শাসন বাংলার সীমান্তের খুব কাছাকাছি চলে আসে। বাংলার সঙ্গে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্কও তখন থেকে শুরু হয়। বলা চলে হুসেনশাহীদের শাসন আমল হচ্ছে মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাস গঠনের যুগ।

খ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ-এর ক্ষমতারোহণ

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে নতুন রাজবংশের উত্থান ঘটে। এটিকে 'হুসেন শাহ' বংশের শাসন বলা হয়। সবদিক বিবেচনা করলে বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে যোগ্য ও বিখ্যাত শাসক ছিলেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। বাংলার শাসনে তিনিই হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার চাঁদপাড়া গ্রামে তার পিতা সৈয়দ আশরাফ বসবাস করেন। তিনি নিজ যোগ্যতা বলে হাবসি শাসনামলে উজিরের পদে আসীন হন। তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করে হাবসিদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। যে সব স্থানীয় আমির হাবসিদের আমলে চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন তিনি তাদের স্বপদে বহাল করেন। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি একশ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেন।

এ আমলে ছিল বাংলার স্বাধীন সালতানাত শাসনের সর্বোচ্চ খ্যাতির শাসন। রাজ্যের সম্প্রসারণ, স্থিতিশীল প্রশাসন স্থাপন, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির জন্য এই আমলটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। তখন বাংলা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিকভাবে পৃথক পরিচয়ে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছিল। বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যও আপন সত্তায় উজ্জীবিত হয়েছিল।

গ. সুলতানি বংশের শাসন ও এর অবসান

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ যখন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ড় ছিলেন তখন জৈনপুরের শর্কিদের সঙ্গে দিলি- র সুলতান সিকান্দার লোদীর সংঘর্ষ বাঁধে। শর্কিরা বাংলায় আশ্রয় প্রার্থনা করলে হুসেন শাহ তাদের আশ্রয় দেন। এতে দিলি- ক্ষুব্ধ হয়ে বাংলার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ এড়িয়ে শান্তি চুক্তি হয়। এর ফলে উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ বাংলা লাভ করে। তিনি কামরুপ-কামতা দখল করেন, আরাকানিদের তাড়িয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম উদ্ধার করেন। বাংলাকে তিনি আবার শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। ১৪১৯ সালে তার মৃত্যু হলে পুত্র নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.) বাংলার ক্ষমতায় বসেন। ঐ সময় ইব্রাহিম লোদির দুর্বলতার সুযোগে আফগানগণ পাটনা থেকে জৌনপুর অঞ্চলে স্বাধীন হয়ে উঠে। বিহারে লোহানী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই সুযোগে আজমগড় পর্যন্ত রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। ঐ সময় ভারতে মুঘল যুগের সূচনা ঘটতে থাকে। সম্রাট বাবর বাংলায় তার বাহিনীও প্রেরণ করেন। নুসরত শাহ বাংলার সিংহাসনকে নিরাপদ রাখার জন্য মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু ১৫৩১ সালে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। এরপর নুসরত শাহের পুত্র আলাউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩ খ্রি.) সিংহাসনে বসেন। অবশেষে ১৫৩৮ সালে আফগান নেতা শের শাহ গৌড় দখল করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলার দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানি আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মুঘল আমলে (১৫২৬-১৭৫৭ খ্রি.) বাংলার শাসন ঃ বারভূঁইয়াদের শাসন আমল

ক. পটভূমি

দিল্লির শাসন ক্ষমতায় ১৫২৬ সালে মুঘলরা অধিষ্ঠিত হলেও বাংলায় মুঘলদের শাসন ১৫৭৬ সালের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখানে আফগান শূর ও কররানি বংশের শাসন অব্যাহত ছিল। ১৫৭২ সালে দাউদ খান কররানি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাংলায় শক্তিশালী সেনাবাহিনী, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার ও প্রভূত সম্পদের অধিকারী হন। নিজেকে তিনি দিল্লির সম্রাট আকবরের সমকক্ষ ভাবতে শুরু করেন। নিজের নামে তিনি খুতবা পাঠ ও মুদ্রা চালু করেন। কররানির আচরণকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবর বাংলা অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন।

খ. আকবরের বাংলা বিজয়

সম্রাট আকবর জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনির খানকে বাংলা আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৫৭২ সালে তিনি বাংলা আক্রমণ করেন। দাউদ খান শক্ত কোনো প্রতিরোধে না গিয়ে মুনির খানকে ধনরত্ন দিয়ে তার সঙ্গে আপস করেন। এতে আকবর তার ওপর অসন্তুষ্ট হন। আকবরের নির্দেশে ১৫৭৩ সালে আবার মুনির খান আল-বিহার অধিকারের জন্য আক্রমণ করেন। এখানে দাউদ কররানি শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সম্রাট আকবর স্বয়ং বিহার অভিযানে অংশ নেন। পাটনা দুর্গে আশ্রয় নেওয়া দাউদ কররানি ও তার সৈন্যদের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় আফগানরা বাংলায় পালিয়ে আসে। বিহার অধিকার সম্পন্ন করে সম্রাট আগ্রায় ফিরে যান, মুনির খান কররানির রাজধানী তান্ডা আক্রমণ করেন। দাউদ খান তান্ডা ছেড়ে হুগলির সপ্তগ্রামে আশ্রয় নেন। তান্ডা অধিকার শেষে মুঘল সৈন্যরা সপ্তগ্রাম অগ্রসর হলে দাউদ খান উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। মুঘল সেনাপতি টোডরমল এবং মুনির খান তাকে অনুসরণ করেন। ১৫৭৫ সালের ৩ মার্চ তুকারায় উভয় বাহিনীর

তুমুল যুদ্ধ হয়, দাউদ খান কন্টক দুর্গে আশ্রয় নেন, মুঘল সৈন্যরা সেই দুর্গ ঘিরে ফেললে দাউদ সন্ধি করতে বাধ্য হন। কন্টকের সন্ধি মোতাবেক দাউদ খান সম্রাট আকবরের আনুগত্য মেনে নেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বশেষ রাজমহলের যুদ্ধে আফগান বাহিনীকে মুঘলরা পরাজিত করেন। দাউদ খানের শোচনীয় পরাজয় ঘটলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়, বাংলায় আফগান কররানিদের শাসনের অবসান ঘটে। তবে বাংলায় তখন বার ভূঁইয়াদের শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়েন মুঘল বাহিনী।

গ. বার ভূঁইয়াদের পরিচয়

আফগানদের শাসনামলে বাংলায় বার ভূঁইয়াদের উত্থান ঘটে। তারা জমির খাজনা বা ইজারা লাভের সুযোগে জমিদার হয়ে উঠেন। হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্য থেকেই এসব জমিদার বংশ সৃষ্টি হয়। যদিও এদের বার ভূঁইয়া বলা হয়, কিন্তু তাদের প্রকৃত সংখ্যা ১২-এর অধিক ছিল। আকবরের বাহিনী বাংলায় প্রবেশ করলে জমিদারগণ শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাদের নিজস্ব সৈন্য ও নৌবাহিনী ছিল। উল্লেখযোগ্য বার ভূঁইয়াদের মধ্যে ছিলেন সোনারগাঁয়ের জমিদার ঈসা খান, ভাওয়ালের গাজী পরিবার, বাকুড়ার বীর হামির, চন্দ্রদ্বীপের পরমানন্দ রায়, ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য, যশোরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, পাবনার রাজা রায়, মানিকগঞ্জের বিনোদ রায় প্রমুখ।

ঘ. আকবরের শাসনামলে বার ভূঁইয়াদের প্রতিরোধ (১৫৮৪-১৬১২ খ্রি.)

সম্রাট আকবর বার ভূঁইয়াদের প্রতিরোধ দমনের জন্য কয়েকজন সুবাদারকে বাংলায় প্রেরণ করেন। এরা হলেন ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খান, ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে সাদিক খান, ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে উজির খান এবং ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা মানসিংহ। বেশ কিছু যুদ্ধ ও প্রতিরোধের পরও সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলার বার ভূঁইয়াদের বিদ্রোহ দমন করা যায়নি।

ঙ. সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বার ভূঁইয়াদের দমন

দিল্লির মসনদে জাহাঙ্গীর সম্রাট নিযুক্ত হওয়ার পর বাংলার বার ভূঁইয়াদের বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়। তিনি ইসলাম খানকে (১৬০৮-১৬১৩) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে বাংলায় প্রেরণ করেন। ইসলাম খান বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। তখন বার ভূঁইয়াদের মূল নেতা ছিলেন সোনারগাঁওয়ের জমিদার মুসা খান। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে করতোয়া নদীর পূর্বতীর যাত্রাপুরে মুসা খানের সৈন্যদের সঙ্গে ইসলাম খানের বাহিনীর যুদ্ধ হয়। মুসা খান শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। সেই সময় বাহাদুর গাজীসহ আরো কয়েকজন জমিদার আত্মসমর্পণ করেন। তবে ভুলুয়ার অনন্ড় মাণিক্য মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেননি, তিনি আরাকানে চলে যান। সিলেট অঞ্চলে জমিদার উসমান লোহানী মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ হারান। ইসলাম খান কোনো কোনো জমিদারকে বশীভূত করেন। এভাবে ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকায় প্রবেশ করেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন। তার আনুগত্য প্রকাশ করায় তিনি সোনারগাঁয়ের জমিদার মুসা খানকে জমিদারি ফিরিয়ে দেন। মুসা খানের পর অন্য অনেকেই হতাশ হয়ে মুঘল শাসনের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এর ফলে বাংলায় বার ভূঁইয়াদের বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মুঘলদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলায় সুবাদারী শাসন

ক. মুঘল সম্রাট আকবর ভারতবর্ষকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রদেশকে 'সুবা' বলা হতো। সুবার শাসনকর্তাকে সুবাদার বলা হতো। তারা মুঘল সম্রাটদের ইচ্ছানুযায়ী নিযুক্ত হতেন। সুবাদারগণ সামরিক, বেসামরিক, আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক, অভ্যন্ড়রীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ দমনের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তারা দিলি- র সম্রাটদের উপদেশ, নির্দেশ ও মতামত নিয়ে সুবা প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কোনো সুবাদার মুঘল সম্রাটের আদেশ পালনে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হতো। বাংলায় সুবাদারী ব্যবস্থা বার ভূঁইয়াদের প্রতিরোধের কারণে সাথে সাথে চালু করা যায়নি, এটি সুবাদার ইসলাম খানের (১৬০৮-১৬১৩) আমল থেকে বাংলায় কার্যকর হয়।

খ. বাংলার সুবাদারগণের পরিচয় ও কার্যক্রম

সুবা-বাংলার ইতিহাসে ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.) অত্যন্ত গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন। তিনি বার ভূঁইয়াদের বিদ্রোহ দমন, তাদের বশীভূত করা, বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় আনা এবং ঢাকাকে জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত করার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইসলাম খানের মৃত্যুর (১৬১৩ খ্রি.) পর ১৬৬০ সালে মীর জুমলা সুবাদার হওয়ার আগ পর্যন্ড় যারা সুবাদার নিযুক্ত হন তাদের অনেকেই তেমন অবদান রাখতে পারেননি। এ সময়ে সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ভাই ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ (১৬১৭ খ্রি.), কাশিম খান জুয়িনী (১৬২৮-১৬৩২ খ্রি.), ইসলাম খান মাসহাদী (১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রি.), মুহম্মদ সুজা (১৬৩৯-১৬৫৯ খ্রি.) কয়েকজন সুবাদারের নাম উল্লেখ করা যায়। তবে আওরঙ্গজেবের অন্যতম সেনাপতি মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.) সুবাদার হিসেবে নানাভাবেই কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি আসাম ও কুচবিহার পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। তবে মীর জুমলা ও মুজাফফর জঙ্গ সুবাদার নিযুক্ত হয়েও বাংলায় আসেননি। মীর জুমলার পর অস্থায়ীভাবে দিলির খান ও দাউদ খান বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব পালন করেন। সম্রাট

আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খান দুই পর্বে (১৬৬৪-৭৮, ১৬৭৯-৮৮ খ্রি.) বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব পালন করেন। শায়েস্ড়া খান বাংলার প্রথম সুবাদার যিনি চট্টগ্রামের মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। এ ছাড়া ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মুঘলদের প্রথম সংঘর্ষ তাঁর আমলেই ঘটে। শায়েস্তা খানের পর অনেকে বাংলার সুবাদার হন। তিনি রাজস্ব সংস্কারে বড় ধরনের অবদান রাখেন। তিনিও স্বাধীন সুবাদরের মতো বাংলা শাসন করেন।

গ. সুবা-বাংলার শাসন ব্যবস্থা

বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের সুবা-বাংলা বলা হতো। সুবা-বাংলাকে 'সরকার' এবং সরকারকে কয়েকটি 'পরগণায়' ভাগ করা হয়। সরকার ছিল জেলার মতো। এ সব জেলার শাসকদের 'ফৌজদার', পরগণার শাসকদের 'শিকদার' বলা হতো। ফৌজদাররা সামরিক ও শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। এ ছাড়া ভূমি রাজস্বই ছিল সুবার প্রধান আয়ের উৎস। বিভিন্ন নিয়মে তা আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। মুঘল আমলে বঙ্গদেশে এভাবে প্রশাসন, রাজস্ব ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে ভিত্তি চালু করা হয় তা পরবর্তীকালে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বাংলার নবাবি শাসন (১৭১৭-১৭৫৭ খ্রি.)

ক. মুর্শিদকুলী খানের শাসনামল (১৭১৭ খ্রি.) থেকে সুবা-বাংলার চরিত্রে কিছু শব্দ ও চরিত্রগত পরিবর্তন আসে। সুবাকে তখন 'নিজামত' (নবাবি) এবং সুবাদারকে 'নাজিম' (নবাব) বলা হতো। আগে মুঘলরা সুবেদার নিয়োগ করতেন। এই সময় (১৭১৭ খ্রি.) থেকে নবাবি প্রাপ্তির বিষয়টি বংশগতভাবে অব্যাহত থাকার নিয়ম করা হয়। প্রথা হিসেবে মুঘল সম্রাটদের কাছে একটি আবেদন করা হতো। নবাবগণ প্রদেশের স্বাধীন শাসকের মর্যাদা লাভ করেন। এর ফলে দিলি- র শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশের শাসন ক্ষমতায় পারিবারিক উত্তরাধিকারদের আইনগত বৈধতা লাভ ঘটে বা সুবাদারী শাসনে ছিল না। মুর্শিদকুলী খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। নবাবি ব্যবস্থার প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেন মুর্শিদকুলী খানের উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁর কন্যার স্বামী। তাঁর কন্যা জিনাত-উন-নেসার স্বামী সুজাউদ্দীন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মতো তিন প্রদেশের স্বাধীন নবাব-এর মর্যাদা নিয়ে সিংহাসনে বসেন। সুজাউদ্দীন খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান উক্ত নবাবির নবাব নিযুক্ত হন। কিন্তু সরফরাজ খানের বির"দ্ধে বিহারের নায়েব ই নাজিম আলীবর্দী খান বিদ্রোহ করেন। সরফরাজ খান এতে পরাজিত ও নিহত হন। মুঘলদের অনুমোদন ব্যাতিরেকেই আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। নিজের নবাবির উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর আপন কন্যাই তাঁর মনোনীত নবাব সিরাজকে গ্রহণ করেনি। নবাব পরিবারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাই শুধু নয় গোটা ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতা হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে সব নিয়ম-নীতিতে বাংলার মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার অভ্যন্ড়রীণ নানান দুর্বলতা এসব ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

খ. পলাশির যুদ্ধ ও নবাবি শাসনের অবসান

আলিবর্দী খান ১৭৫৬ সালে তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে পরবর্তী উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেন। এতে আলিবর্দী খানের পরিবারের মধ্যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ইংরেজরা তা কাজে লাগায়। ইংরেজরা সিরাজের আদেশ অমান্য করে কাশিম বাজার কুঠি ও ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করে। এ নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ক্রমে সিরাজের সভাসদ মীর জাফর, জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে গড়ে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননের যুদ্ধে মীর জাফরের চক্রান্তের ফলে সেনাবাহিনী নীরব ভূমিকা পালন করে। সিরাজ যুদ্ধে পরাজিত এবং পরে নিহত হন। বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.১

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. বাংলা তুলনামূলক শাসন আলোচনা করুন।
২. বাংলার হাবসী শাসন কী?
৩. বাংলায় হুসেনশাহী বংশের শাসন কেমন ছিল?
৪. মুঘলামলে বাংলার শাসন কেমন ছিল?
৫. বাংলায় সুবাদারী শাসন মূল্যায়ন করুন।
৬. বাংলায় নবাবী শাসন কেমন ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলায় তুর্কি শাসনের বিবরণ দিন।
২. বাংলার স্বাধীন সুলতান যুগের বর্ণনা দিন।

৩. ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শাসন সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৪. বাংলায় মুঘল আমলের বিবরণ দিন।

পাঠ-২: মধ্যযুগের বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতির গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।

ক. সামাজিক অবস্থা

তের থেকে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ তুর্কি, স্বাধীন সুলতানি, মুঘল সুবাদারি ও নবাবি শাসনের অধীন ছিল। বাংলা ভুখন্ডে দীর্ঘ এই সময়ে সামন্ত কৃষি অর্থনীতিই প্রধান ছিল। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটিরশিল্পও ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছিল। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির প্রভাবে মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মিত হয়েছিল।

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে বহির্দেশ থেকে আগত মুসলিম প্রভাব শুধুমাত্র শাসন ক্ষেত্রেই নয় সমাজজীবনেও স্থায়ী আসন লাভ করেছিল। হিন্দু ধর্ম বাংলাদেশের সমাজে যতখানি শক্ত ভিত্তি পেতে সমর্থ হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্ম ততখানি ধরে রাখতে পারেনি। বহিরাগত মুসলিম রাজ শাসন বাংলার সমাজজীবনের সঙ্গে দ্রুত আত্মীকরণ করার ফলে ধর্মীয়ভাবে ইসলাম বৃহত্তর বাঙালি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। মধ্যযুগে বিশেষত ইলিয়াসশাহী শাসনের সূচনাকাল থেকেই বাঙালি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ সমাজ সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করেছিল। মুঘল আমলে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠে। ঐ সময়ে দ্বিজবংশীর লেখা 'মনসামঙ্গল' ধর্ম সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল উদাহরণ। ধর্মীয় পরিচয় বাঙালি হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধের মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ বা সংকট সৃষ্টি করেনি। মুসলিম শাসন নিয়ে যেমনিভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বা বিরোধ সৃষ্টি করেনি, মুসলিম শাসকগোষ্ঠীও হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা দানে কার্পণ্য করেনি, রাষ্ট্র ও প্রশাসনে তাদের অংশ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেনি। দেখা গেছে হিন্দু সমাজের মধ্যে যারা লেখাপড়া ও আর্থিকভাবে অগ্রসর (ব্রাহ্মণ, ক্ষৈত্রিয়) ছিলেন তারাই সামন্ড় সমাজের নিয়ম অনুযায়ী অভিজাত শ্রেণী হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে গ্রহণ ও ভোগ করেছে। সামন্ড় সমাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আর্থিক ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়া মানুষ অধিকতর শোষিত ও অবহেলিত হতো। বাংলাদেশও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক শোষিত হতো, অপেক্ষাকৃত অসচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতো। তবে মধ্যযুগে বাংলাদেশে খাদ্য, পুকুরে মাছ, গোয়াল ভরা গরু থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ. জাতিগত পরিচয়

বাংলাদেশ ভূখন্ডে বসবাসকারী বিভিন্ন জনপদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রাজশাসনের ফলে মধ্যযুগের আগেই সংগঠিত হতে থাকে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টি হতে থাকে। তবে বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতিসত্তার ভিত্তিই সবচেয়ে সংগঠিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, যা অন্য উপজাতিগুলো পারেনি। তবে পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আরাকানদের প্রভাব ছিল, মধ্যযুগের মাঝামাঝি ও শেষের দিকে চাকমাসহ বিভিন্ন পাহাড়ি উপজাতি পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে এসে পার্বত্যঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে বৃহত্তর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর যোগাযোগ তেমন ছিল না। উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল, রাজবংশী, গারো জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালির অপেক্ষাকৃত যোগাযোগ ছিল। বাঙালিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্প্রীতিমূলক ছিল।

ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটে সুফিসাধক এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রভাবে। বঙ্গদেশে নিম্নবর্ণের অত্যাচারিত ও শোষিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে বাঙালি মুসলিম বলে একটি সম্প্রদায়ের সংযোজন ঘটে। এর আগে এখানে জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও পারসিক ধর্মাবলম্বীর বসবাস ছিল। তবে মধ্য যুগে তুর্কি, আফগান, মুঘল, ইরানি, আরব, হাবসিসহ মধ্য প্রাচ্যের আরো কিছু জাতিগোষ্ঠীরও আগমন ঘটে বাংলায়। ষোড়শ শতকে পর্তুগিজ এবং আর্মেনীয়দেরও বসতি বাংলায় স্থাপিত হয়। চট্টগ্রামে আরাকানি জাতিগোষ্ঠীর বসতি স্থাপিত হয়। ফলে মধ্যযুগে বাঙালি জাতিসত্তায় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর আরো ব্যাপক মিশ্রণ ঘটেছিল।

গ. সুফিবাদের প্রভাব

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে ইসলাম প্রচার, চরিত্র গঠন, আত্মার উৎকর্ষ সাধন, মানব কল্যাণে কাজ করা ইত্যাদি আদর্শকে সম্মুখে নিয়ে সুফিসাধকগণ বাংলাদেশে আসেন। বাংলার প্রতিটি আনাচে-কানাচে তাদের প্রতিষ্ঠিত 'খানকা' গুলো আধ্যাত্মিক, মানব কল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্ড়ার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ক্রমে তারা বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চিন্ড়াকে সমন্বিত করে সুফিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মরমী চিন্ড়াধারাকে আত্মস্থ করায় সুফিবাদের প্রতি হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় আকৃষ্ট হয়। ফলে বাংলার সুফিবাদ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অধিকতর উদার ও মানবকেন্দ্রিক চরিত্র অর্জন করে। সুফিবাদের কারণে বাংলার সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘাত দারুণভাবে লোপ পায়। মরমী বাউলরা হিন্দু-মুসলিম মিলনের আদর্শই প্রচার করে।

ঘ. বঙ্গীয় সামন্ড় সমাজ

দীর্ঘ যে সব রাজশাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশ ভূখন্ডে কার্যকর ছিল তাতে ইসলাম ধর্ম, সুফিবাদ, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্ম, বিদেশী শাসক, বণিক ও সাধারণ মানুষের আগমন বাংলার সমাজ ব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্ড়ার করেছিল। মুঘল আমলে ঢাকা রাজধানী হওয়ার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর ফলে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি পূর্বাঞ্চলে বেশি ঘটেছিল। কিন্তু সামন্ত রাজতান্ত্রিক আর্থ-শাসন ব্যবস্থা এবং সমাজের অভ্যন্ড়রে টিকে থাকা বর্ণ ও শ্রেণী বৈষম্যের কারণে বঙ্গীয় মধ্যযুগীয় সমাজ থেকে শ্রেণী বিভেদ সমূলে উৎপাদন করা যায়নি। আভিজাত্যের ভিত্তিতে স্বয়ং মুসলিম সমাজই আশরাফ, আতরাফ ও আরজল নামে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশীয় ও বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল হচ্ছিল না। হিন্দুদের মধ্যেও জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথা প্রবল ছিল। বস্তুত বঙ্গীয় সামন্ত সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, জমি বন্টন ইত্যাদি কাজে যারা জড়িত ছিলেন তারা অভিজাত বা উচ্চবংশীয় বলে নিজেদের চালচলন, জীবনযাপনে প্রতিষ্ঠিত করে, অপেক্ষাকৃত কম কড়ির কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন সমাজের নিম্নবর্ণ, আতরাফ, ক্রীতদাস, চাকরবাকর ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য বঙ্গীয় সামন্ড় সমাজে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রেই বিভাজন সৃষ্টি করে রেখেছিল।

মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতি

ক. বিভিন্ন শাসনামলে অর্থনৈতিক অবস্থা

মধ্যযুগের বিভিন্ন দেশী-বিদেশী রাজশাসনের ফলে এই ভূখন্ডে এক ধরনের মধ্যযুগীয় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। এর ফলে প্রশাসন, অর্থনীতিসহ সর্বত্র মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাপনার প্রচলন ঘটে। ইবনে বতুতা, মাহুয়ান, বারথেমা, বারবোসা, আবুল ফজলসহ বিদেশী বিভিন্নজনের লেখায় বাংলাদেশের তৎকালীন অর্থনীতির সমৃদ্ধির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। তারা সকলেই বাংলাদেশের অর্থনীতির সচ্ছলতার কথা উলে- খ করেছেন। মূলত সুলতানি যুগে বাংলা স্বাধীন থাকার কারণে কৃষি, কুটিরশিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে চরম সমৃদ্ধি ঘটেছিল। মুঘল আমলে পরাধীনতার কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য না থাকায় সমৃদ্ধি অনেকটা স্ড়িমিত হয়ে পড়ে। তারপরও মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলার জীবনযাত্রার মান দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি 'বঙ্গদেশের আনাচে কানাচে বেহেস্ড়' বিরাজ করছে বলে তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন। বস্তুত মুঘলদের আগের মামলুক বংশ, ইলিয়াসশাহী বংশ, হুসেনশাহী বংশ, শূর বংশের রাজত্বকালে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধির ধারায় চলেছিল। মুঘলরা ক্ষমতা দকলের পর রাজস্বনীতি, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর সরকারি নীতি-নিয়ম আরোপ করায় অর্থনীতি কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতিতে পরিচালিত হতে থাকে। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত সুবা-বাংলার সঙ্গে ভারতসহ বহির্বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে মুঘল যুগে আধুনিক বাংলার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনারই প্রবর্তন ঘটেছিল।

খ. কৃষি অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি চিরকালই কৃষিনির্ভর ছিল। মধ্যযুগের সকল রাজবংশের শাসনামলে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বাংলাদেশ চিরকালই শস্য-শ্যামলা চিরসুন্দর নয়নাভিরাম বলে দেশী-বিদেশীদের হৃদয় জুড়িয়েছে। এতে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশেরই পরিচয় ফুটে উঠেছে। বছরে তিনবার ফসল উৎপাদন করতো বলেই মধ্যযুগে বাংলার দেড় কোটি মানুষকে তিন বেলা ভাত খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল বাংলাদেশ। ধানের পাশাপাশি পাট, গম, আম, যব, লাক্ষা, তেলবীজ, রসুন, মরিচ, মসলা, রেশম, রবিশস্য, ইক্ষু ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করা হতো। বাংলা থেকে প্রচুর চাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হতো।

গ. কুটির শিল্প

মধ্যযুগের বিভিন্ন শাসনামলে কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প ছাড়াও বেশ কিছু শিল্প বিশ্বজোড়া বাংলার খ্যাতি নিয়ে এসেছিল- এর মধ্যে বস্ত্রশিল্প ও রেশম শিল্পের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার বেশ কিছু জায়গায় লোহাজাত জিনিসপত্র তৈরি হতো। বাংলায় কাঠের আসবাবপত্র ও সময়েই বিশেষ গুরুত্ব পায়। নদ-নদীর দেশে নৌকা ছাড়া চলাফেরা করা যেত না।

ফলে এখানে নৌকা ও জাহাজ শিল্প প্রসার লাভ করে। দেশবিদেশে বাণিজ্যের জন্য বড় বড় নৌকা ও জাহাজ তৈরি করা হতো। বাংলার 'মসলিন' কাপড়ের চাহিদা দেশের বাইরে তুরস্ক, খোরাসান, পারস্যসহ বিভিন্ন দেশে ছিল। তখনকার অর্থনীতিতে এর প্রভাবও ব্যাপক ছিল। ইউরোপের বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা হিসেবে বাংলার গুরুত্ব ছিল। এর নানা রকমের কাঁচামাল, মসলিন, তাঁতের কাপড় ইত্যাদির প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল।

ঘ. ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নগর-বন্দরের ভূমিকা

মধ্যযুগের বাঙালি সওদাগররা 'সপ্তডিঙ্গা-মধুকর' ভাসিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতেন বলে অনেক গল্প চালু আছে। তখন বাঙালিরা সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার), মালয়, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন ইত্যাদি দেশ পাড়ি দিত। বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে চট্টগ্রামের নাম তখন দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে বিপুল অর্থ উপার্জন করার ফলে মধ্যযুগে গৌড়, পান্ডুয়া, সোনারগাঁও, হুগলী, ঢাকাসহ বেশ কিছু উন্নতমানের শহর এখানে গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। বিনিময় প্রথার উলে- খযোগ্য পরিবর্তন ঘটে মধ্যযুগে। শেরশাহ রৌপ্যমুদ্রা তথা 'রুপিয়া' চালু করেন। আকবর স্বর্ণ নির্মিত 'ে'মোহর' ও রূপা নির্মিত 'জালালা' এক সঙ্গে চালু করেন। খুচরা বাজারে 'কড়ি' চলতো। সরকার এগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করতো। এর ফলে অচিরেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ প্রাণ ফিরে পায় বাংলার অর্থনীতি। অর্থনীতির এসব সংস্কার বাংলায় নগর সভ্যতা চাঙ্গা করে, বেনিয়া ইংরেজদের আকৃষ্ট করে, মজুরিভিত্তিক কর্মচারী, চাকরিজীবী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। এর ফলে সম্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে সামন্তকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে অভ্যস্ত অভিজাত ব্যবস্থায় আধুনিক নগরকেন্দ্রিক আভিজাত্যের প্রচলন ঘটানো।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

ক. বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ

মধ্যযুগের আগে বাংলা ভাষার লিপি রচনার গতি বেশ ধীর ছিল। পাল ও সেন যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি থাকায় বাংলা ভাষার তেমন উন্নতি হয়নি। বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো নমুনা বলে পন্ডিতরা চিহ্নিত করেছেন চর্যাপদকে। চর্যাপদের ভাষা পুরোপুরি বাংলা নয়, বলা চলে এটি বাংলা-পূর্ববর্তী ভাষা। কিন্তু তারপরও চর্যাপদকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ একে চর্যাগীতি বলেন। কেননা, এতে রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মুখে মুখে এগুলো গান হিসেবে প্রচলিত ছিল। বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে চর্চাপদের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, এগুলো থেকে প্রাচীন বাংলা এবং তার ঠিক আগেকার ভাষার নমুনা ও সমাজের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। পাল ও সেন যুগের বৌদ্ধ গুরুরা এসব চর্যাপদ রচনা করেন। অষ্টম, নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসব গান রচিত হয়েছে। এর ভাষা ছিল একই সঙ্গে বাংলা, অহমিয়া এবং উড়িয়া ভাষার পূর্বপুরুষ। পরে বাংলা ভাষা উড়িয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, লাভ করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পরে অহমিয়া ভাষাও বাংলা থেকে পৃথক হয়ে যায়। চর্যাপদের পর দীর্ঘকাল বাংলা ভাষার কোনো নমুনার কথা জানা যায়নি। মনে করা হচ্ছে যে, সেন রাজাদের আমলে প্রচুর সংস্কৃত শাস্ত্র এবং সাহিত্য রচিত হলেও মুসলমানদের আগমনের প্রথম দু'শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিকে তেমন কোনো দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বড়ু চন্ডীদাসের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' উল্লেখযোগ্য পুঁথি সাহিত্য কর্ম। এতে বাংলা ভাষার শব্দের রূপ খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষা নতুন গতি লাভ করে সুলতানি যুগে। ফারসি ও আরবির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত বিকাশ ঘটে। স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাংলা ভাষাকেও অপরিহার্য করে তোলে। সুলতানি যুগে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার প্রসার ঘটে। ইলিয়াসশাহী আমলে মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলায় ভাবপ্রবণ ও মানবতাবাদী সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। বাংলার সুলতান রুকনউদ্দিন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ' রচনা করেন। চট্টগ্রামের শাসক পরাগল খার সহযোগিতায় কবি পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করেন। আরো অনেক গ্রন্থই তখন রচিত হয়। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক কাব্যের সাহিত্য রচনা শুরু হয়। ষোড়শ শতকে সারিবদ্ধ খাঁ নামক একজন মুসলমান 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। হুসেনশাহী যুগে (১৪৯৩-১৫৩৮) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করে। বাংলার শাসকগণ এ সময়ে দেশীয় সাহিত্যের প্রতি সকল প্রকার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন।

খ. শিক্ষা ব্যবস্থা

মধ্যযুগের বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকরা শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সুফিসাধকগণ 'খানকাহ'গুলোকে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দেশে মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসা গড়ে তোলা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব বেশি ছিল। মুসলমান শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা মক্তব দিয়ে শুরু হতো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরবি, ফার্সি ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। সম্রাট আকবরের শিক্ষানীতিতে পাঠ্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন

করা হয়। মক্তবেও গদ্য-পদ্য পড়ালেখা ছাড়াও কবিতা মুখস্থ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংক আবশ্যক করা হয়। ফার্সি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ যথেষ্ট এগিয়ে আসেন। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, রসায়ন ইত্যাদি পড়ানো হতো। তবে মধ্যযুগে বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা তেমন গড়ে উঠেনি। নারীদের শিক্ষা ছিল সীমিত আকারের এবং তা প্রধানত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ছিল।

গ. স্থাপত্য ও শিল্পকলা

মধ্যযুগে যে সব দেশ থেকে শাসকশ্রেণী বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন বহন করে এনেছিলেন। এগুলো তাদের ব্যক্তিত্বের এবং প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তবে পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্যের উপকরণ বাংলায় বেশি লক্ষ করা গেছে। মসজিদ নির্মাণে বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও মুঘলরা যতখানি যত্নবান ছিলেন সুলতানি যুগে এই শিল্পের তেমন কদর ছিল না। ফলে বাংলায় চিত্র শিল্প ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ততটা বিকশিত হতে পারেনি। তবে মুঘল আমলে ঢাকাসহ কিছু কিছু জায়গায় মসজিদ, সমাধি, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি নির্মাণে স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন স্থাপিত হয়েছিল। এই ধারা সুবাদারদের আমলেও অব্যাহত ছিল। ঢাকায় নবাব আমলের জিনজিরা প্রাসাদসহ নির্মিত ইমারতসমূহ এখন দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। কিছু কিছু পুল, ঈদগাহ, চিল্লা খানা মধ্যযুগের দর্শনীয় স্থাপত্যের পরিচয় বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.২

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. মধ্যযুগের বাংলার অর্থনীতি কেমন ছিল?
২. মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ কেমন হয়েছিল?
৩. মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বর্ণনা দিন।
২. মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি বর্ণনা দিন।
৩. মধ্যযুওগ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ বর্ণনা দিন।